রবীন্দ্রনাথের নগর ও স্থাপত্য ভাবনা: প্রেক্ষিত জাপান ভ্রমণ ও যাত্রাপথ

রাকিবুল হক রনি[১]
ড. মো. আকতার মাহমুদ[২]

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬ সালে তোসামারু জাহাজে চড়ে যাচ্ছেন জাপানে, জাহাজে চড়ে। জাহাজ পথে থেমেছে বেশকিছু বন্দরে, ভিন্ন ভিন্ন শহরে। সেসব শহর পর্যবেক্ষণ করে শহর কিংবা বন্দরের গঠন ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য তিনি লিখে রেখেছেন তাঁর ডায়রিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নগর ও স্থাপত্য ভাবনার সাথে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ভাবনার একটি তুলনামূলক চিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। জোনিং, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও নগরায়ন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ন্যাচার এন্ড ল্যান্ডস্কেপ, কনজারভেশন এন্ড প্রিজারভেশনের মত স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন আস্পেক্ট খুঁজে পাওয়া গেছে রবি ঠাকুরের *জাপানযাত্রী* ভ্রমণকাহিনীতে।

আমাদের দেশে প্রচলিত প্ল্যানিং প্রসেসে ইআইএ (পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন) ও পপুলেশন প্রজেকশন নামে দুটি এসেসমেন্ট টুল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তিক্ত সত্য এই যে, আমাদের দেশে ইআইএ কেবলই একটি নামমাত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্টের কারণে মূল প্ল্যানের পরিমার্জন হতে খুব একটা আমরা দেখি না। অর্থাৎ অর্থনীতির কাছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার শপথ হেরে যায় বারবার। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বাস্তুসংস্থানের উপর এবং যথারীতি মানুষের জীবনের উপর। আর অন্যদিকে পপুলেশন প্রজেকশন বেশিরভাগ সময়ই মাইগ্রেশনের বিভিন্ন ফ্যাক্টরের কারণে ও পুরনো ডাটা ব্যবহারের কারণে যথার্থ হয় না। কাজেই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ টুল কার্যত ব্যর্থ। ফলে পরিকল্পনা কিংবা উন্নয়ন কোনোটাই হিউম্যান স্কেলে তো হয়ই না, হয় না টেকসইও। মানুষের ক্রমপরিবর্তনশীল জীবনাচরণের ছবি ধরা পড়ে সাহিত্যে। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা সাহিত্য কেবল সাহিত্যিকের কল্পনাই নয়, বরং সাহিত্য হলো বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। আমাদের সামনে যে বিশাল ডাটা সোর্স (বাংলা সাহিত্য) অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তা থেকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল কিংবা শহরের মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ধারাটি খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। আর তা সম্ভব হলে, ওই অঞ্চলটিতে বসবাসরত মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ ধরন সম্বন্ধে ধারণা করাও সম্ভব হবে। আর সেই ধারণা স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হলে আমরা অনেক বেশি সাস্টেইনেবল সিটি (টেকসই শহর) পাবো, উন্নয়ন হবে হিউম্যান স্কেলে।

স্থাপত্য ও নগরপরিকল্পনা পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদেরই কেবল স্থাপত্য ও শহর নিয়ে ভাবনা আছে, এমন তো নয়। শহরের সকল বাসিন্দা, একটি স্থাপনার বাসিন্দা, তা তারা যে ইনকাম লেভেলেরই হোন না কেনো, সকলেরই এই বিষয়ে ভাবনা রয়েছে। তাদের সেই ভাবনাকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনার প্রয়াস থেকেই সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া। *জাপানযাত্রী* এই কাজটির জন্য খুবই উপযুক্ত।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: সাহিত্য, স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপান

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ 'বিশ্বকবি' নামে অভিহিত করে থাকে। তাঁর এই অভিধা যথার্থ প্রমাণিত হয় সারা পৃথিবীজুড়ে কবির যোগাযোগ ও পরিচিতির মাধ্যমে। পৃথিবীর অনেক দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তবে জাপানের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও ভালো লাগা ছিলো। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন এশীয় জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে। তবে ক্রমাগত জাপানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে কবি খুশি তো ছিলেনই না, বরং প্রকাশ্যে জাপানি জাতীয়তাবাদের সমালোচনাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হওয়ার পর জাপান সরকার তাঁকে জাপান ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালেও তিনি তাতে সাড়া দিতে আগ্রহী ছিলেন না একদমই। ১৯১৫ সালের ১১ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারী সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ ও পাদ্রী চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুস (Charles

[১] রাকিবুল হক রনি, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
[২] ড. মো. আকতার মাহমুদ, অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Freer Andrews) কে তিনি এক চিঠিতে লিখেন, "I have given up Japan and I feel more and more sure, it is not for me"[১] কারণ অবশ্যই জাপানের আগ্রাসী সামরিক কৌশল। তবু পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে তিনি জাপান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তোসামারু জাহাজে চড়ে রওনা হন। সেখানে গিয়েও জাপানি জাতীয়াতাবাদের সমালোচনা করায় সমালোচকদের আক্রোশের শিকার হন। তবে জাপানের যা কিছু ভালো, তা গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন না। শিল্প, অর্থনীতি, সাহিত্য, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রে জাপানিদের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন তিনি। জাপান যেতে যেতে বিভিন্ন বন্দরে থেমেছেন, জাপানের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছেন তিনি। কথা বলেছেন অনেকের সাথে। সেসবের স্মৃতি ডায়রিতে লিখেও রেখেছেন। সেই লেখা নিয়েই প্রকাশিত হয় ভ্রমণকাহিনী *জাপানযাত্রী*। এই বইয়ে তিনি জাপান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা, ইন্টেরিয়র ডিজাইন প্রভৃতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। ১৯৬০ সালের দিকে নগর পরিকল্পনা আলাদা পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আমাদের সকলেরই তা জানা। তারও প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় আগে কবির নগর ও স্থাপত্য ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক ছিলো, তা খুঁজে দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

জাপানের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাত্রার শুরু থেকে জাপান অবস্থানকালে বিভিন্ন শহরের স্থাপত্যিক ও পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সকল মন্তব্য করেছেন, সেসব খুঁজে বের করা হয়েছে *জাপানযাত্রী*'র বিশ্লেষণী পাঠের মধ্য দিয়ে। সেসব ভাবনার সাথে সাম্প্রতিক আর্কিটেকচারাল ও প্ল্যানিং রিলেটেড থিওরি ও বিশেষজ্ঞ মতামতের একই তুলনামূলক চিত্র দাঁড় করানো হয়েছে।

রেঙ্গুন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোসামারু জাহাজে চড়ে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জাহাজ ছাড়ছিলো না। ঐ অবস্থায় রাতের আঁধারকে চূর্ণ করা প্রকট আলো বিধাতার সাথে কলহে লিপ্ত বলে মনে হচ্ছিলো রবি ঠাকুরের। তাঁর মনে পড়ছিলো এডেন বন্দরের কথা। তাঁর চোখে ভাসছিলো মানুষের কর্মে এডেন বন্দরের দুর্দশার চিত্র! তিনি জানাচ্ছেন তেলে সয়লাব সমুদ্রের কথা, মানুষের আবর্জনায় শ্রী হারানো সমুদ্রের দশা! প্রকৃতির সাথে মানুষের এরূপ বিরূপ আচরণে প্রকৃতিপ্রেমী কবি আহত হয়েছিলেন খুবই। চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, "সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড় দেওয়া গেরুয়া নদীর শাড়ী পরে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখেছি।"[২] কবি দুই পাড়ে সবুজ গাছ-পালাসহ নদীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শব্দের এমন সুমধুর সুর বেঁধেছেন। পরের বাক্যেই তিনি জানাচ্ছেন, "সাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেছে।"[৩] তিনি বলছেন, ভূতত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বাইরে গিয়ে প্রকৃতিকে দেখবার প্রয়াস এটি তাঁর। সে যেমন প্রয়াসই হোক, এত মনোহর উপমায় ব্যাখ্যা যাকে করছেন, সেই প্রকৃতিকে তিনি কতটা আপন ভাবেন, কতটা অনুভব করেন, তা তাঁর শব্দ চয়ন, উপমার ব্যবহারেই বুঝতে পারা যাচ্ছে খুব। প্রকৃতিকে দেখা আর নির্মাণের সম্পর্ক দাঁড় করাতে গিয়ে কবি বলছেন, "নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে।"[৪] তিনি বলছেন, কেবল নির্মাণ করলেই তো হলো না, যা নির্মাণ হচ্ছে, যার জন্যে হচ্ছে তার প্রয়োজনের মাপে হতে হবে সে নির্মাণ। নির্মাতা যদি নিজের প্রয়োজনেও নির্মাণ করেন, ধরি কোনো ঘর, তাহলেও তার যত বড় ঘর দরকার, ঘরে যা যা যতটা থাকা দরকার, তার বেশি কিছু কিংবা তার চেয়ে বড় কিছু গড়া ভীষণ অপ্রয়োজনীয়। এই পরিমিতিবোধের ভাবনার প্রতিফলন পরবর্তীতে কবি শান্তিনিকেতনে তাঁর পরিকল্পনা ও নির্দেশিত স্থাপত্যেও দেখিয়েছেন। ছোট শোবার ঘর, আসবাবের বিলাসিতা পরিহার তারই সাক্ষ্য দেয়। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঘরে নন্দ লাল সেনসহ বিভিন্ন চিত্রশিল্পীকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন এবং আমরা জানি বিলাসী হতে শিল্পীদের প্রতি তাঁর বারণ ছিলো।

ধরে নিই, রবীন্দ্রনাথ একটি ভবন নির্মাণের কথা বলছেন। তিনি বলছেন, ভবনটিকে অবশ্যই মাপ অনুযায়ী তৈরি করতে হবে আর সেই মাপটি নির্ধারিত হবে নিজের প্রয়োজন অথবা যার জন্য বানানো হচ্ছে তাঁর প্রয়োজনের মাপে। অন্যদিকে বিখ্যাত স্থপতি লুই আই কান (Louis Kahn) বলছেন,

> Architecture has its limits - and when we touch the invisible walls of its limits, then we know more about what is contained in them. A great building, in my opinion, must begin with the unmeasurable, go through measurable means when it is being designed, and in the end must be unmeasurable. The design, the making of things is a measurable act: At that point, you are like physical nature itself, because in physical nature everything is measurable - even that which is yet unmeasured, like the most distant stars which we can assume will eventually be measured. But what is unmeasurable is the psychic spirit. The psyche is expressed by feeling and also thought and, I believe, will always be unmeasurable. I sense that the psychic existence will call on nature to make what it wants to be.[৫]

একটি ভবনের নকশা করার জন্য অবশ্যই চমৎকার একটি আইডিয়া দরকার। আইডিয়া তো আর পরিমাপ করা যায় না। সেই আইডিয়াকে উপজীব্য করে কাজটা এগিয়ে নিতে থাকতে হবে অবশ্যই স্থাপত্যের কিছু বিধি মেনে। শেষে যা দাঁড়াবে, তা একেবারেই নতুন কিছুই নিশ্চয়ই, তুলনা করার মত অন্য আরেকটি ভবন হয়ত থাকবে না। তার মানে নতুন সৃষ্টি পরিমাপযোগ্য নয়। কালোত্তীর্ণ স্থাপত্য এভাবেই জন্ম নেয় হয়ত। রবীন্দ্রনাথের সাথে কিছুটা মতের অমিলই ঘটলো বটে লুই কানের। কিন্তু মিলও তো বেশ! পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি কেউ।

যাই হোক, রেঙ্গুনে পৌঁছে চমকে উঠলেন রবি ঠাকুর। জানালেন, "এমনও হতে পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়।"[৬] ইরাবতী নদী হয়ে শহরের কাছাকাছি আসতে আসতে রবি ঠাকুর খেয়াল করলেন বড় বড় কেরোসিনের কারখানা, শত শত জাহাজের ভিড়। বন্দরের জেটিগুলোকে তাঁর মনে হলো শহরকে আঁকড়ে ধরা অতিকায় লোহার জোঁক একেকটা। বন্ধুর বাসায় যাবার পথেও শহরকে বাণিজ্যের ভারে নতজানু মনে হলো কবির। তিনি জানাচ্ছেন বাণিজ্য শহর ও মানস-সরোবরের সৌন্দর্যশতদল ফুটতে দেয় না এবং রেঙ্গুন তেমনি এক শহর। একটা শহরে মানুষের বিকাশের জন্য, অবসর যাপনের জন্য, বিনোদনের জন্য যে উপকরণগুলো থাকা দরকার বলে নগর পরিকল্পনা বিদ্যা মনে করে, রবি ঠাকুর জানাচ্ছেন রেঙ্গুনে তার কিছুই নেই। কবিগুরু তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, "এ শহর দেশের মাটি থেকে গাছের মত ওঠে নি।"[৭] তিনি হয়ত শহরের স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর বিকাশের কথা বলছেন, মুনাফার আকাঙ্ক্ষায় এমন আরোপিত শহর তাঁর পছন্দ নয়। তিনি জানাচ্ছেন, "পৃথিবীতে যেসব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে।"[৮]

একটা গাছ যেমন ধীরে ধীরে ডাল-পালা ছড়াতে ছড়াতে পূর্ণাঙ্গ হয় এবং প্রয়োজনীয় যত্ন-আত্তি, খাবার-জল পেলে সেটি ফল দেয়, তেমনি একটি শহরেরও তো দরকার পড়ে যত্নের, ভালোবাসার, মমতার। একটি শহরকে ভালোবাসায়, মমতায় গড়তে দরকার পড়ে উপযুক্ত পরিকল্পনার। একটি গাছ যেমন জল, পরিচর্যা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ এবং ফলদায়ী হয়ে উঠতে পারে না, তেমনি একটি শহর উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়া ভালোবাসার শহর, মমতার শহর হয়ে উঠতে পারে না। নগর পরিকল্পনা বলছে, শহরের খাবার হলো পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, ওপেন স্পেস, যথার্থ জোনিং, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, উপযোগী ব্যবস্থাপনাসহ নানান কিছু। এর কোনোটা না পেলে শহর আসলে মানবকল্যাণমুখী হয় না, ফল দেয় না, যথার্থ বিকাশ তার হয় না। উল্টো তার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ক্ষয়ের দিকে দৌড়ায় দ্রুত। মানুষের মমতায় শহর তৈরির কথা বলছেন রবি ঠাকুর। যথার্থ ভালোবাসার শহর গড়তে একজন পরিকল্পনাবিদকে অবশ্যই মানুষের প্রয়োজন, সমস্যা, পরিবেশ দূষণের প্রতিকার, বাসিন্দাদের জীবনকে সহজতর করার উদ্দেশ্যকে মাথায় নিয়েই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন এবং নগর পরিকল্পনাও তাইই বলে। প্রখ্যাত স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ ল্য করব্যুজিয়ে (Le Corbusier) এর একটি উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "The materials of city planning are: sky, space, trees, steel and cement; in that order and that hierarchy."[৯] মাটির নিচে শহরের ভিত্তি রচিত হয় স্টিল আর সিমেন্ট দিয়ে। একটি গাছকে শহর ভেবে নিলে ফাউন্ডেশন হলো সেটির শিকড়। মাটির উপর ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা অর্থাৎ পুরো

গাছটির অবস্থান। তার উপর স্পেস এবং তারও উপর আকাশ। একই সুরে গান গাইলেন দুই ভুবনের দুই শিল্পী। আর পর্যাপ্ত পরিচর্যা পেলেই যেমন একটি গাছ যথার্থ ফলদায়ী হয়ে উঠে, তেমনি শহরেরও পরিচর্যা দরকার, শহরকে মানুষের ভালোবাসতে হবে। ভালোবেসে পর্যাপ্ত ওপেন স্পেস রাখতে হবে, জোনিং মেইনটেইন করতে হবে। রাস্তাঘাট হতে হবে প্রশস্ত এবং শহরের কর্তাদের সকল পেশার নাগরিকদের কথা ভাবতে হবে, ইনক্লুসিভ চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে তাদের কাজে।

অপরিকল্পিত নগরায়ণের কদর্যতার কথা বলতে গিয়ে কবি নিজেকে সৌভাগ্যবাণ ভাবছেন কেননা কলকাতা বাণিজ্যের গ্রাসে চলে যাবার আগেই তিনি জন্মেছিলেন, গঙ্গার দুই তীর তখনো প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সাজ হারাতে শুরু করেনি। কবিগুরু বলছেন,

> কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে অধিকার করে নি। কিন্তু তাঁর পরে বাণিজ্য সভা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।[১০]

জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নগর পরিকল্পনাবিদ ও আইনজীবি পিটার মার্কেস (Peter Marcuse) এর একটি উদ্বৃতি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক, "Neither cities nor places in them are unordered, unplanned; the question is only whose order, whose planning, for what purpose?"[১১]

একটি শহর যদি পরিকল্পিতও হয়ে থাকে, তথাপি সেই পরিকল্পনাটি কে কেন করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিল্পপতি যদি শহরের কর্তা হয়ে বসে থাকেন, তবে শহর এগুতে পারে স্ট্রাকচারাল উন্নয়নের দিকে ব্যবসার পরিধি বাড়াবার জন্যে, আরো বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। কোলকাতার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিলো। মহাত্মা গান্ধী একজন পরিকল্পনাবিদ নন, তবু তাঁর সময়ে ভারতের উন্নয়ন নিয়ে একটি উক্তি খুবই গুরুত্ব বহন করে। "Urbanization in India is a slow but sure death for her villages and villagers."[১২] এমন নগরায়ন কারো কাম্য নয় নিশ্চয়ই।

নগর পরিকল্পনায় প্রিজারভেশন, কনজার্ভেশনের কথা বলা হয়। রবি ঠাকুর জাপানে যেতে যেতে ভেবেছেন কলকাতায় আসলে এরই অভাব প্রবল। যথার্থ পরিকল্পনায় এগুলে বাণিজ্য, কালের গ্রাসেও হারত না শহরটি। বাণিজ্য আর সৌন্দর্য যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীও হয়ে উঠেনা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনামাফিক এগুতে পারলে, সেই কথা এবং সঠিক পরিকল্পনাহীনতার পরিণামের কথা জানাতে গিয়ে রবি ঠাকুর বলছেন, "প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখা যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ন করে দিচ্ছে।"[১৩] একটা যথার্থ পরিকল্পনার অভাব বাণিজ্যের নির্মম গ্রাস ডেকে আনে, লাগামহীন বাণিজ্য ঘোড়া শহরের সৌন্দর্য আর স্বাভাবিক রূপ মুছে দেয়, আরোপ করে নতুন এক রূঢ় বাস্তবতা। নতুন এই পঙ্কিলতা মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তারক্তি পর্যন্ত ডেকে আনে বলে মনে করেন কবি।

রেঙ্গুন শহরে দেখবার মত, চমকে যাওয়ার মত একটা মন্দিরই কেবল তাঁর চোখে পড়েছে। বাণিজ্যের করাল গ্রাসের মাঝে এই এক মন্দির তাঁকে নতুন কিছু দেখবার, পুলকিত অনুভব করবার সুযোগ করে দিয়েছে। হাট-বাজারের হট্টগোল নেই সেখানে। এমনকি ধর্মের বেড়াজালও শিথিল! সেখানে মানবিক বোধের চর্চার উল্লেখ কবি করেছেন *জাপানযাত্রী*তে। রেঙ্গুনে এই মন্দিরের অবস্থান আবিষ্কারের ব্যাপারে কবি বলেছেন,

> আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই; তারা খুব গটগট্ করে চলে, খুব চট্‌পট্ করে ইংরেজি কয়; দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টল্‌টল্ করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্‌গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।[১৪]

পিনাঙে তমসা

রেঙ্গুন ছেড়ে পিনাঙ বন্দরের কাছে এসে 'জল স্থলের প্রেমের মিলন'[১৫] দেখে কবি উচ্ছ্বসিত হলেন। ওখানকার পালতোলা জাহাজের 'জল বাতাসের সাথে সন্ধি'[১৬] দেখে তাঁর মনে হলো কলের জাহাজের সুবিধা বেশি হলেও সৌন্দর্য ও অন্যান্য দিক থেকে জুড়ি নেই পালতোলা জাহাজের। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না।"[১৭] প্রকৃতির সাথে জোর না খাটিয়ে তাকে মেনে নিয়ে, প্রকৃতির পাশ না কাটিয়ে, ক্ষতি না করলে শহর, অঞ্চল গড়ে তোলার কথা বলেন নগর পরিকল্পনাবিদরা। গ্রিন সিটির ধারণা সারা দুনিয়াময় জনপ্রিয় এখন। রবি ঠাকুর সেই ভাবনা ভেবেছেন ১৯১৬ সালেই, তাসামারু জাহাজে বসে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, "যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চলতে হয়েছে সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না"[১৮]। কিন্তু যখনই বন্দরে গা ঘেঁষে ধারালো জাহাজ, রবি ঠাকুর মর্মাহত হলেন। চোখের সীমায় ধরা পড়লো "কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আচড় কাটতে।"[১৯] অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনেই। মানুষের এই বোধ-বিবেচনাহীন কাজকে কবিগুরু যথার্থই বলছেন 'নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করা।'[২০] প্রকৃতিকে হয়ত তিনি স্বর্গজ্ঞান করছেন। প্রকৃতির মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে, তার ক্ষতি না করে শহর গড়বার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির সাথে মিতালী করে নগরায়ন মানুষের সৃষ্টিকে সুন্দরতর করে তোলেই বলে মত দিয়েছেন কবিগুরু। বাংলাদেশের প্রখ্যাত স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ মাজহারুল ইসলামের মতে,

> ঢাকা শহরের কতগুলো বিশিষ্ট গুণ আছে। আমার মনে হয় লুই কান সেগুলো সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। ঢাকা শহরের তিন দিকে নদী, এক দিকে নিচু জায়গা, উত্তর-দক্ষিণ প্রশস্ত একটা দ্বীপের মতো। এর ভিতরে অনেক খাল-বিল, যেগুলো স্বভাবতই ব্যাবহার করা হত। মোঘল আমলে নতুন ঢাকা যেটা দেখছেন, বাগানে বাগানে ভাগ করা ছিল বিভিন্ন নামে। মজার ব্যাপার ছিল। তখন প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে লোকে শহরে বাস করত। শহরেও প্রকৃতি বেশি দূরে ছিল না। আমি মনে করি এই সম্পর্ক আমাদের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অন্যদের জন্যও এর প্রয়োজন আছে।[২১]

মাজহারুল ইসলাম শহরেও প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন। এমনকি ঢাকায় প্রকৃতির নানান উপাদানকে টিকিয়ে রাখতে লুই কানের প্রচেষ্টার কথাও জানালেন তিনি।শান্তিনিকেতনে একের পর এক ঘর নির্মাণ হবার পর কবিগুরুর মনে হলো কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। ভাস্কর রামকিঙ্কর বাইজকে ডেকে তিনি স্থাপত্য আর প্রকৃতির মধ্যে সেতু স্থাপন করার দায়িত্ব দিলেন। রামকিঙ্কর বাইজ একে একে অনেকগুলো ভাস্কর্য স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতি আর স্থাপত্যের বিরোধ মিটানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। ভাস্কর্যকে চারুকলার ত্রিমাত্রিক রূপ বলা যেতে পারে। শিল্প যেমন মানুষ ও স্থাপত্যের মধ্যকার সেতু হিসেবে কাজ করে, তেমনি ভাস্কর্য হলো স্থাপত্য ও প্রকৃতির মধ্যকার সেতু। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ওরভিল ডগলাস (William Orville Douglas) নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত জোনিং বোর্ডে বোটানিস্টসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের থাকার গুরুত্বের ব্যাপারে বলেন, "I've often thought that if our zoning boards could be put in charge of botanists, of zoologists and geologists, and people who know about the earth, we would have much more wisdom in such planning than we have when we leave it out the engineers."[২২]

কবির চোখে জাপান

পথে অন্যান্য যেসব বন্দরে নেমেছেন কবি, তার চেয়ে আলাদা তাঁর মনে হয়নি হংকংকেও। সেই একই প্রকাণ্ড সব দানবীয় স্থাপনা! বাণিজ্যের সেই একই করাল গ্রাস। পরিস্থিতিটা বুঝাতে কবিগুরু জানাচ্ছেন বাণিজ্য নামের দানব যা পাচ্ছে, তাই মুখে পুড়ছে বিকট ও ভয়ানক শব্দ করে, গিলে নিচ্ছে! ধীরে পুরো শহরটাই হয়ত তার পেটে চলে যাবে। বলছেন,

> লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা-উপশিরার ভিতর দিরে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে। তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে।[২৩]

যে বাড়িতে তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন, সেটির জানালা দিয়ে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে "এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্ত মাংসের নয়।"[২৪] এমন জাপান দেখে কবির মনে হয়েছে সবুজ পৃথিবীকে খেয়ে ফেলছে দৈত্যাকার ড্রাগন। লোহার চালার ঘর দেখতে দেখতে রবি ঠাকুরের মনে হয়েছে মানুষের যতটা দরকার নেই, তার চেয়ে বেশি অধিকারে নিতে সে আগ্রহী এবং এই লোভ মানুষকে ভুগাবে। জাপানিদের শান্তিপ্রিয়তা আর সহ্যশক্তির প্রশংসা করলেও জাপান তাঁর জাপানিত্ব হারাতে বসেছে, পোশাকে, অফিস-কাচারির কাঠামোতে এবং নানাভাবে, মনে হয়েছে কবির। নিজের সংস্কৃতি, চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখাও নিশ্চয়ই একটি শহরের বাসিন্দাদের দায়িত্ব। জাপানের বাগান এবং বাগান পরিচর্চা বিদ্যার প্রশংসা রবি ঠাকুর করেছেন *জাপানযাত্রী*'তে। কবি লিখেছেন, "কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে মাটির উপর জিয়োম্যাট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানি বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়; জাপানি চোখ এবং হাত দুই-ই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষা লাভ করেছে, যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে।"[২৫] আমরা দেখতে পাই জাপান ভ্রমণে দেখে আসা বাগানের চর্চা তিনি শান্তিনিকেতনেও করেছেন পরবর্তীতে। ইতালীর ডি পেস্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থপতি লিভিও সাকি (Livio Sacchi) এর মতে,

> The expression of mono aware, man in tune with nature, and at the same time the supreme representation of nature itself. [The Japanese garden] must have no trace of artificial elements. This naturally, makes it extremely artificial, but it doesn't matter, the garden is a representation of an abstract idealized nature, a sort of original earthly paradise or pre-figuration of heavenly paradise.[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বললেন কেবল কাঁকর ফেলা আর জিওমেট্রি কষাই বাগান করা নয়, তা যে কতটা সত্য তা আন্দাজ করা যায় অধ্যাপক লিভিও সাকির এই মন্তব্যে। *mono no aware* মানে হলো এমন এক তীক্ষ্ণ বোধ, যা কোনো একটি বস্তু থেকে নির্গত হচ্ছে। বলা যায়, বহুলাংশে বেদনার বোধ, শূন্যতার হাহাকার কিংবা বিষন্নতার সুর। শীতে পাতাদের ঝরে পড়া আমাদের যেমন অদ্ভুত এক বিষন্নতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, বসন্তের আগমন যেমন ভালোলাগার অনুভূতির উদ্রেক করে- তেমন এক গভীর অনুভূতির কথা বলে জাপানি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দগুচ্ছ। মাছেদের নিঃশ্বাসের শব্দ কিংবা ব্যাঙের ফুসফুসের ক্ষীণ অথচ শুনতে জানলে প্রখর সেই তীব্রতার সারমর্ম *mono no aware.* বাগান করার ক্ষেত্রে জাপানিদের রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার প্রমাণ আমরা লিভিও সাকির কথায় পাই। দক্ষতা ও প্রকৃতিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মিশেলে বাগানের প্রতিটি উপাদান এমন করেই সাজায় জাপানিরা যেন সেই উপাদান শক্তিশালী যোগাযোগ গড়ে তোলে। জাপানি বাড়ি-ঘরের অন্তঃসজ্জায় পরিমিতিবোধ দেখে মুগ্ধ কবি বলেছেন,

> দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ, বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। ঘরে যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে ঘরের মেঝের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায় তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না।[২৭]

প্রথমবার জাপান ভ্রমণের বেশ কয়েকবছর পর আমরা দেখি শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর নির্দেশিত প্রতিটি বাড়িতে উপরোল্লিখিত এই প্রতিটি বাক্যের ভাবের যথার্থ প্রয়োগ। আসবাবের বাতুলতা তো ছিলই না, বরং বাক্স-পেটরাকে শোবার এবং বসবার কাজে রবি ঠাকুর ব্যবহার করেছিলেন তাঁর থাকবার ঘরে। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত তাঁর বিভিন্ন বাড়ির শোবার ঘরগুলোও আয়ত্তের মধ্যে, সুবিশাল নয় মোটেও। জাপানি ঘর দেখে কবিগুরু বলেছেন:

> বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোন জিনিস আঘাত করছে না, কানকে বাজে কোন শব্দ বিরক্ত করছে না। মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।[২৮]

কবিগুরু মনে করতেন অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেবল ঘরের বোঝা নয়, মানুষের মনের জন্যও তা বোঝা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব গুছিয়ে রাখলে তা কেবল বোঝা কিছুটা কমায়, একেবারে মুক্তি দেয় না মোটেও। এখন ইনটেরিয়োর ডিজাইন আমরা যাকে বলি, তাতেও মিনিমালিস্টিক কিংবা সিম্পল এপ্রোচ অর্থাৎ পরিমিতিবোধকে

দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ধারণা সৌন্দর্যপ্রীতি থেকেই এই পরিমিতিবোধ জন্মেছে জাপানিদের হৃদয়ে। তাঁর ধারণা ইউরোপের প্রতি মোহগ্রস্থ না হয়ে ভারতবষের মানুষেরা যদি জীবনযাত্রার রীতি জাপানের কাছ থেকে নিঃসঙ্কোচে নিতে পারত তাহলে ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা, অব্যবস্থা, অসংযম দূর হত। স্থাপত্য কেমন হওয়া উচিৎ, সে ব্যাপারে জাপানের স্বশিক্ষিত স্থপতি তাদাও আন্দো (Tadao Ando) বলেন, "The essence of Minimalism is simplicity, but simplicity without depth is merely cheap. It is not enough."[২৯] সিমপ্লিসিটির উপর ভিত্তি করে মিনিমালিজমের জন্ম। একটি স্থাপত্য সিম্পল হলেও তাতে গভীরতা থাকা জরুরি। কবির বয়ান থেকে জানা যায়, তাঁর দেখা ঘরটিতে অনাবশ্যক কোন জিনিস নেই। তাছাড়া দর্শনেন্দ্রীয়ের প্রশান্তি ও বসবাসের শান্তির কথা বলেছেন লেখক। স্থাপত্যে গভীরতা না থাকলে, তা সম্ভব নয় কোনোভাবেই।

আবশ্যক আর অনাবশ্যকের আলাপে প্রাসঙ্গিকভাবেই কবি তুলে আনেন তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপের কথা। সব পুকুর ভরাট করে ফেলবার কাজ-কারবার, গঙ্গায় যত পারা যায় তত ব্রিজ, জেটি, জাহাজের হাট বসানোর ক্রিয়া-কলাপ তাঁর ভালো লাগেনি। পৃথিবীর আপন জলের আসনগুলোর এমন মৃত্যু পরোয়ানা, অবকাশ যাপনের একটু খানি ফুসরত হরণ করার এই কাজে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এখন এত বছর পরে এসে আমরা দেখি, নগর পরিকল্পনায় জলাধার এবং নদী ভরাট না করা এবং এই দুইয়ের পরিচর্যা ও সংরক্ষণের বয়ান কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শেষকথা

মিনিমাল স্থাপত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মায় জাপান ভ্রমণের মাধ্যমে। একটি ঘরের ভেতরের সজ্জা কেমন হবে, জানালা কত বড় হবে কিংবা জানালার সংখ্যা কত হবে, ঘরটির বহিরাংশ কেমন হবে, টানা বারান্দা থাকার সুফল কী- এইসব কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কবি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে করেছেন। শহরের গঠন কেমন হওয়া উচিৎ, কীভাবে বেড়ে উঠা উচিৎ একটি শহর, সেসব ব্যাখ্যা করতেও তিনি ভুলেননি। এমনকি সীমাহীন মুনাফার লোভে প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করার ফল যে ভয়াবহ হয়, তাও তিনি বলেছেন। নির্মাণের কৌশলের ব্যাপারেও কবি আলোকপাত করেছেন। আর তাঁর অবজারভেশনের সাথে প্রথিতযশা স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদদের চিন্তার সম্মীলন অভিভূত হওয়ার মত। জাপানে দেখে আসা স্থাপত্য কৌশল তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। একজন নগর কিংবা অঞ্চল পরিকল্পনাবিদের কাজ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে নিয়ে পরিকল্পনা করা আর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ভাস্কর, পরিবেশবিদ, জিওলজিস্ট, চিত্রকর এমন অনেক পেশার লোককে প্রয়োজনে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে যুক্ত করেন পরিকল্পনাবিদ। যে অঞ্চলটির পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাতে কেবল মানুষের আবাস নিশ্চিত করাই নয়, বসবাসরতদের মানসিক উন্নতি থেকে শুরু করে অবকাশ যাপন, ওপেন স্পেস রাখা, গাছপালার যথার্থ ব্যবহার, প্রকৃতির সাথে স্থাপত্যের সেতুবন্ধন তৈরি করার কাজটিও একজন পরিকল্পনাবিদের। চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর, কৃষিবিদ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যাট্রিক গ্যাডেস ও আর্থার গ্যাডেস, সি এফ এন্ড্রুস, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বাইজ, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, বীরেন্দ্র মোহন সেনসহ অসংখ্য পেশাজীবীকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গড়বার কাজে লাগিয়েছেন। পরিকল্পনাবিদ, ভুগোলবিদ, সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গ্যাডেস (Patric Geddes) এর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি চালাচালি হয়েছিলো, দুজনের মধ্যে কথা হয়েছিলো নগর পরিকল্পনা নিয়ে। একটি চিঠির ক্ষুদ্রাংশ নিম্নরূপ:

> Your ideas of graphic representation of the growth of human life and mind, the czcle of their activities and varied manifestation has stronglz captured mz mind. I wish we could make place of it in our institution.[৩০]

রবীন্দ্রনাথের স্থাপত্য ভাবনার ব্যাপারে পুরোপুরি জানতে এই একটি গবেষণা মোটেই যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক সাহিত্যকর্ম, চিঠি, বক্তৃতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করার অবকাশ রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Krishna Dutta, Andrew Robinson, *Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man* (New York: St. Martin's Press, 1996, Page 121)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১২)

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৫. Richard Saul Wurman, *WHAT WILL BE HAS ALWAYS BEEN: THE WORDS OF LOUIS I. KAHN* (New York: Rizzoli/Access Press Ltd., 1986, p89)

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১৮)

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৯. *E.g. Weber, Times 1965 (New York, 2008, p186)*

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১৯)

১১. Peter Marcuse, *In Postmodern Cities and Space* (Oxford: Blackwell, 1995, p244)

১২. Mahatma Gandhi, *Weekly Harijan Shevak* (Delhi, The Hindustan Times Press, 1934)

(১৯৩৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হরিজন সেবক' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এই মন্তব্য করেন।)

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ২০)

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২১. কাজী খালীদ আশরাফ, সাইফ উল হক, *বাস্তুকথা : স্থপতি মাজহারুল ইসলামের নির্বাচিত উক্তি* (ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৫)

২২. David Ariel, *Government and the Democratic Process: A Symposium by American and Israeli Experts* (New York: American Histadrut Cultural Exchange Institute, 1969, p.16)

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৩৬)

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৬. Livio Sacchi, *Tokzo: Citz and Architecture* (Torino: Skira Editore, 2004, p119)

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৫১)

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৯. Chelsea Harrison, *The Minimalist* (Citz of Subiaco, 2019, p1)

৩০. মূল চিঠি সংরক্ষিত (রবীন্দ্র ভবন, শান্তিনিকেতন, ১৯২২)